জীবন যেখানে যেমন

আরিফ আজাদ

কালের ঘূর্ণাবর্তে সবকিছুর পালাবদল ঘটছে। পরিবর্তন আসছে জীবনের রূপ ও রঙে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন চিন্তা এসে গ্রাস করছে পুরোনো চিন্তার জগৎ। এভাবেই চলছে গ্রহণ-বর্জনের নিরন্তর চক্র।

কালের এই চক্রে সবকিছুতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগলেও একমাত্র ইসলাম-ই চৌদ্দশত বছর ধরে চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান বিকাশের অবিকৃত ও পরিপূর্ণ ধারায় রয়েছে বিরাজমান। মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা হিসেবে নাযিল হওয়া ইসলামের বার্তাসমূহের রয়েছে সমসাময়িক ও আগামী জীবনের উপযোগিতা। ইসলামের সুমহান সেই বার্তাগুলো-ই বিশ্বাসী মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'সমকালীন প্রকাশন'-এর পথচলা।

সমকালীন প্রকাশন

সূচিপত্র

অশ্রু ঝরার দিনে	১৩
এই প্রেম, ভালোবাসা	২২
আসমানের আয়োজন	২৭
চাওয়া না-চাওয়া	৩৭
এক বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যা	৪৪
জীবনের রকমফের	৫২
হিজল বনের গান	৬২
বিশ্বাস	৬৪
সুখ	৭৪
বোধ	৮৩
বাবাদের গল্প	৯৩
টু-লেট	১০০
মহীয়সী	১০৬
সফলতা সমাচার	১৩১

অশ্রু ঝরার দিনে

জোছনা প্লাবিত রাতের ধবধবে শাদা আকাশ। কোথাও যেন ডাহুক ডাকছে। বুনো ফুলের গন্ধে বাতাস আশ্চর্যরকম ভারী। চাঁদের আলোতে নদী পাড়ের বালিগুলো রুপো চূর্ণের মতো ঝিকমিক ঝিকমিক করছে। থেকে থেকে কানে আসছে কিছু পাতি শেয়ালের ডাক। এসবের বাইরে পুরো দুনিয়াজুড়ে যেন গা ছমছমে নীরবতা। কোথাও কোনো সাড়াশব্দের বালাই নেই।

জোছনার জোয়ার ভেদ করে, গ্রামীণ মেঠো পথের ধুলো উড়িয়ে, বুনো ফুলের বুনো গন্ধকে পাশ কাটিয়ে দুজন মানুষ গন্তব্যে ফিরছে। দুজন বলা কি ঠিক? ওদের সাথে তো আরও একজন আছে। চাদরে মোড়ানো বরফ-শীতল আস্ত একখানা শরীর—নড়চড়বিহীন। তাকেও কি গোনায় ধরা যায়? জীবনের সম্ভাব্য সকল পাঠ চুকিয়ে যে পাড়ি জমিয়েছে অন্য জগতে, এই জগতের বাসিন্দাদের তালিকায় তার নাম উঠানো উচিত হবে?

মাঝে মাঝে বলদগুলো চেঁচিয়ে উঠছে। গোঙানি উঠলেই তাদের পিঠে বসে যাচ্ছে শাদু মিয়ার বেতের বাড়ি। এই জোছনা মুখরিত রাতে, অরণ্যের এই সরু পথ চিনে চলতে বলদগুলোর বিশেষ অসুবিধে হবার কথা নয়। তবু পথ চলতে আজ তাদের রাজ্যের অনীহা। কে জানে, চাদরে মুড়ানো ওই যে নিথর শরীর, তার ভারে হয়তো তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ছে বারংবার। এ ভার বয়ে নিয়ে যাওয়া কি এতোই সোজা?

সত্যিই কি সোজা নয়? যদি নাই বা হবে, শহিদুলের কোলের ওপর ওই নিথর শরীরখানা, ওভাবে নিশ্চিন্তে পড়ে আছে কীভাবে? যে পাথুরে শরীরের ভার বইতে বলদেরা অপারগ, তার ভার কতো সহজেই বয়ে নিয়ে যাচ্ছে শহিদুল। তার কোলে কেমন নিবিড় নিশ্চিন্তে পড়ে আছে ওই দেহখানা। শহিদুলেরও যেন কোনো ক্লান্তি নেই। সেও নিরাবেগ, নিশ্চল, নিশ্চুপ।

কথা শুরু করে শাদু মিয়া। এই ঘন গহিন অরণ্যের মাঝে, যেখানে বন্য জন্তুরাও বেঘোর ঘুমে অচেতন, সেখানে কতোক্ষণই বা আর চুপচাপ পথ চলা যায়? অন্তত শাদু মিয়ার মতন মুখরা মানুষের পক্ষে এতোক্ষণ মুখ বন্ধ করে রাখা সম্ভব নয়।

'তা ভাইজান, পোলাডা মরলো কেমন কইরা?'

মরে গেছে? সংবিৎ ফিরে পায় শহিদুল। সত্যিই মরে গেছে? তার ফুটফুটে আদরের সন্তান, যার মাত্র চার মাস হলো বয়স, সে কি মরে গেছে? তুলতুলে হাতখানা ধরে কতো আদরই না করতো শহিদুল! দেখতে ভারি সুন্দর হয়েছিলো ছেলেটা! সেদিন ডাক্তার বললো, 'আপনার ছেলের বয়স কতো?'

'চার মাস', অস্ফুটে জবাব দিয়েছিলো শহিদুল।

ডাক্তার যেন বিশ্বাস করলো না তার কথা। মুখ তুলে, চশমার পাতলা কাচের ভেতর দিয়ে ভালো করে আরেকবার দেখল বাচ্চাটাকে। এরপর বললো, 'বাচ্চার ডেভলপমেন্ট তো খুবই ভালো। দেখে মনে হচ্ছে এক বছর বয়স।'

অমন আদুরে চেহারা ছিলো যে, কেউ কোলে না নিয়ে থাকতে পারতো না। তুলতুলে শরীর। সবটা ছাড়িয়ে, তার মুখের হাসিটা ছিলো ভুবনভোলানো। চোখে চোখ রেখে, মুখখানা খানিক বাঁকিয়ে যখন সে হাসতো, শহিদুলের মনে হতো, জগতের সকল সরলতা, মুগ্ধতা আর বিস্ময় যেন তার চেহারায় এসে মাখামাখি করছে। তার নিটোল চাহনির দিকে তাকিয়ে নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দেওয়া যায় একটা মানবজনম। কিন্তু, একেবারে হঠাৎ করে, সেদিন প্রচণ্ড জ্বর উঠলো তার। চোখমুখ ফুলে বিপন্ন অবস্থা। ডাক্তার জানাল তার আমাশয় হয়ে গেছে। সাধারণ আমাশয় নয়, রক্ত আমাশয়। কতো যত্ন-খেয়াল, কতো আদর আর আলিঙ্গানের কাড়াকাড়ি— তার মাঝেও ছেলেটার এমন একটা রোগ হয়ে গেলো? তারপর, তারপর একদিন অকস্মাৎ, একেবারে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে শরীরে খিঁচুনি এসে কাহিল করে দিলো

তাকে। হাসপাতালে যখন নিয়ে যাওয়া হয়, ততোক্ষণে সে আর বেঁচে নেই।

বেঁচে নেই! কতো সহজেই হয়ে গেলো বলা! অথচ, শহিদুলের কাছে সে ছিলো তারা ঝলমলে এক পৃথিবী। যেদিন তার জন্ম হয়, যে ভোরবেলায়, কতো কাণ্ডই না সেদিন করেছিলো শহিদুল। তার পাগলামোতে হাসপাতালের সকলে অতিষ্ঠ হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছিলো, 'পাগল!' হ্যাঁ, পাগলই তো। কতো বছর, ঠিক কতো বছর পরে শহিদুলের ঘর আলো করে এই রত্নখানি এসেছে, তা কি এই মানুষগুলো জানে? আল্লাহর কাছে কতো করজোড় মিনতি, কতো আকুল প্রার্থনা, ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ এই ফল, তা কি কেউ বুঝবে?

হেলেদুলে এগিয়ে চলছে শাদু মিয়ার বলদ-গাড়ি। শহিদুল নিরুত্তর। শাদু মিয়া শহিদুলের মনের অবস্থা বোঝার চেষ্টা করে। তার বুকের ভেতর কালবোশেখির যে তাণ্ডব বয়ে যাচ্ছে—সেটা শাদু মিয়ার অজানা নয়। সন্তান হারানোর শোকের সাথে শাদু মিয়াও সবিশেষ পরিচিত। তার ছোটো মেয়ে পারুল, সবে হাঁটতে শিখেছিল কেবল। এক দুপুরে, কোন ফাঁকে যে সে পুকুরতলায় চলে গিয়েছিল, তা আজও রহস্য। অতটুকুন মেয়ে, গুটিগুটি পায়ে অতটুকু পথ পাড়ি দিয়ে সোজা পুকুরে গিয়ে পড়বে আর সারাবাড়ির কেউ তাকে একটিবারের জন্যও দেখবে না—তা কি কম আশ্চর্যের ব্যাপার! সারাদিন খুঁজে খুঁটেও পারুলের হদিস মিললো না। পরে, সন্ধ্যের আগে আগে আস্ত পারুল ভেসে উঠলো পুকুরের মাঝে। পারুলের মৃত্যু নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা, অনেক লোক-গল্পের অবতারণা হয় মানুষের মুখে মুখে। সময় গড়িয়ে যায়, কেবল নেভে না শাদু মিয়ার বুকের দহন। ছোট্ট পারুলের সোনাবরণ চাহনিটা যেন আজও সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে শাদু মিয়ার চোখের সামনে ভাস্বর হয়ে আছে। অতএব, শাদু মিয়া বোঝে সন্তানহারা পিতৃহৃদয়ের যাতনা।

যাত্রী হিশেবে শহিদুলের সাথে আরও একজন আছে। মিনু; শহিদুলের স্ত্রী। সেও নিরুত্তর। নিষ্পলক। তার চোখের দৃষ্টি কোথায়, কোন দিগন্তে গিয়ে যে স্থির হয়ে গেলো, তা কেউ জানে না। যে জঠর ভেদ করে একদিন এসেছিল প্রাণের ফোয়ারা, সেই ফোয়ারা আজ ফুরিয়ে গেছে। নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে শূন্য দিগন্তে। মিনুর বুক ফেটে কান্না আসে, কিন্তু সে কাঁদতে পারে না। অশ্রুরাও আজ পলাতক চোখ থেকে। নিদারুণ অবসাদে ভেঙে আসে শরীর, বিপন্ন বিষাদে ক্ষতবিক্ষত সে, কাতর আর্তনাদে গুঙিয়ে ওঠে মন, তবু আজ যেন কাঁদতে মানা। আজ কি কাঁদবার দিন?

পাথরের মূর্তির মতন বসে থাকে সেও। জোছনা রাঙানো রাতের আকাশ, বুনো ফুলের মনোহর গন্ধ, মাঝে মাঝে ডাহুকের ডাক—এ সবকিছু জুড়ে মিনুর কতো মুগ্ধতা! কিন্তু, শোক আর শখের লড়াইয়ে আজ শোকটাই জয়ী। এই তারাভরা রাত, অরণ্যের অসামান্য সৌন্দর্য—কোনোকিছুতেই আজ মিনুর মুগ্ধতা নেই।

শাদু মিয়ার বলদের গাড়ি যখন জালাল মাস্টারের উঠোনে এসে পৌঁছোয়, তখন আকাশ ধবধবে ফর্সা হয়ে গেছে। ভোরের সোনারঙা রোদ এসে পাতায় পাতায় জাগিয়ে তুলেছে শিহরণ। ঘুম ভেঙেছে পাখ-পাখালির। তাদের মুখরিত কলরব চারদিকে তৈরি করেছে ব্যস্ততার আবহ। সবুজ ঘাসের মাথায় জমে থাকা শিশিরবিন্দুর ওপর রোদের ছোঁয়া এসে লাগায় সেগুলো স্বর্ণরেণুর মতন ঝলমল করে উঠলো। ভোর হয়েছে।

জালাল মাস্টারের বাড়িতে শোক যাপনের একটা আগাম প্রস্তুতি নেওয়া ছিলো, কেবল আনুষ্ঠানিক যাত্রা পর্বটাই বাকি। শহিদুলদের আগমনে যেন সমস্ত শোক আছড়ে পড়লো বাড়িটার প্রশস্ত উঠোনে। বাড়ির মহিলারা ডুকরে কেঁদে উঠলো। হায় হায় রব উঠলো আকাশে-বাতাসে। শহিদুলের মা, পাথর হয়ে বসেছিলেন উঠোনের এক কোণে। শহিদুলের কোলে চাদরে মুড়ানো নিথর শরীরটার দিকে দৃষ্টি পড়তেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনিও। বুক চাপড়ে কান্না-বিজড়িত গলায় বলতে লাগলেন, 'এ কী হলো রে ব্যাটা তোর! এ কী হলো!'

শোকের মাতমে জালাল মাস্টারের বাড়ি তখন আচ্ছন্ন। শোকে মুহ্যমান মানুষগুলোর চেহারায় ভর করেছে ঘন বিষাদের কুয়াশা। রোদের তীব্রতাও এই কুয়াশা কাটাতে পারে না। একখানা মাদুরে আলতো করে শহিদুল শুইয়ে দিলো তার কোলে থাকা নিথর শরীরটাকে। তারপর, আস্তে আস্তে অনাবৃত করলো তার চেহারা। যখন চাদরের আবরণ ভেদ করে প্রস্ফুটিত হলো সন্তানের অবয়ব, শহিদুল, আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। জমানো শোকের ভার আর সইতে পারল না সে। সন্তানের অনড় দেহটাকে বুকের সাথে জড়িয়ে নিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে তুলল সারা দেহ।

এখনো পাথর মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিনু। মাদুরে শোয়ানো সন্তানের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। চেহারায় নেমে এসেছে কালবোশেখির সমস্ত ঘন কালো মেঘ। তার অসহায় চাহনি, ব্যথাতুর চোখে সে যেন শেষ বারের মতন দেখে নিচ্ছে বুকের মানিককে।